কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনা ।

আব্দুস সালাম তরফদার
জেলা বাজার কর্মকর্তা , খুলনা ।

নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী গুন আর প্রতিভার কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে । তিনি কালজয়ী কবি , লেখক , নাট্যকার ,ছোটগল্পের অমর স্রষ্ঠা, চিত্রকর , সংগীত রচয়িতা ,গীতিনাট্যকার প্রভৃতি ।তিনি তার সমগ্র হাজার সৃষ্ট কর্মের মধ্যেও কৃষি আর কৃষকের কল্যানে তাঁর জীবদ্দশার অনেকটা সময় আত্মনিয়োগ করেন ।তিনি কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন কৃষকের আথ-র্সামাজিক উন্নয়নের প্রানান্ত প্রচেষ্টা করে গেছেন । তিনি অবিভক্ত বাংলায় কৃষকের মাঝে আধুনিক কৃষি উন্নয়নের শুভ সূচনা করেন ।গ্রামীন জনপদে আর্থ-মামাজিক উন্নয়নের যে দৃষ্টিভংগি তাঁর ছিল তার প্রায় সিংহভাগই কৃষিকে ঘিরে । পিতৃ পুরুষের জমিদারী তদারকি আর লেখলেখির মধ্যে দিয়েও তার অর্ন্তদৃষ্টি বাংলার কৃষকের কর্মকান্ডকে ছুঁয়ে গিয়েছিল ।তাই তিনি অবিভক্ত বাংলার কৃষি আর কৃষকের দুরাবস্থার কথা হৃদয়ের আকুতি দিয়ে লিখেছেন , '' আমাদের কৃষক একদিকে মূঢ়, আর একদিকে অক্ষম; শিক্ষা আর শক্তি দুই দিক থেকেই বঞ্চিত ।''

কবি গুরুর লেখনি আর চিন্তা চেতনায় কৃষি উন্নয়ন ভাবনার অসংখ্যা চিত্র পাওয়া যায় ।তিনি ছিলেন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা ।তিনি কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তির পথ খুজেঁ ছিলেন । কোন এক সময় রবীন্দ্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ এক কৃষি বিজ্ঞানী লিওনাড এলমহার্স্ট শান্তি নিকেতনে আসেন । তিনি আধুনিক ধাচেঁর কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্যে শ্রীনিকেতনের আশে পাশের জনবসতিকে উদ্বুদ্ধ করেন ।কবিগুরু হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন যে অর্থনৈতিক উন্নতি আর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আধুনিক কৃষির বিকল্প নেই ।

কবি গুরু আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রথম দর্শন লাভ করেন তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের মধ্যদিয়ে । তিনি রাশিয়ার কৃষি খামারে কর্মরত কৃষকের কর্মনিষ্ঠা আর আত্ম প্রত্যায়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন ।তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন রাশিয়ার কৃষকের অসাধারণ উদ্যাম আর উদ্ভাবন দেখে ।

তিনি জমিদারী সূত্রে আমাদের দেশের সেরা দুটি কৃষি প্রধান এলাকায় একাধিকবার ভ্রমণ করেছিলেন ।প্রমত্তা পদ্মা অববাহিকার পলিযুক্ত উর্বর জনপদ বৃহত্তর পাবনা আর কুষ্টিয়া জেলার সোনার মাটিতে তিনি তাঁর পদচিহ্ন একেঁ গেছেন অনেকবার ।তৎকালীন পাবনা জেলার শাহজাদপুর (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা) এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এলাকায় পিতৃপুরুষের জমিদারী সূত্রে অস্থায়ী আবাসও গড়ে তোলেন ।তিনি দেখেছিলেন প্রজা সাধারণের নিয়মিত খাজনা সুষ্টুভাবে আদায়ের জন্যে কৃষকের কৃষি উৎপাদন ও কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘঠানো আবশ্যক । তিনি শিলাইদহের কৃষকের মধ্যে আলু চাষের উদ্যেগ নিয়েছিলেন তিনি মাদ্রাজ হতে সরু চালের বীজ আর আমেরিকা হতে ভূট্টাবীজ এনেছিলেন । তাছাড়া কপি , শিম , মটর ইত্যাদি চাষের জন্যে পাবনা কুষ্টিয়া সহ সমগ্র বাংলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন । তিনি কুষিটয়ায় চাষ উপযোগীতার কথা বিবেচনা করে ইক্ষু চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ।শুধু তাই নয় তিনি উৎপাদিত ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্রে মাড়াই কল স্থাপনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।

কবি গুরু কৃষি বহুমুখি করণেরও রুপকার ছিলেন ।তিনি এক ফসলি জমির পরিবর্তে দুই বা তিন ফসলি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি রাসায়নিক সার , আধুনিক যন্ত্রপাতি , উন্নতজাতের উচ্চফলনশীল বীজ আমদানীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি তিনি শান্তি নিকেতনের গন্ডি থেকে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ।

দরিদ্র অসহায় কৃষদের সংগঠিত করতে তিনি সমবায়ের উপর জোর দেন ।তিনি তার রচনাবলীর সমবায় নীতিতে লিখেছেন, '' যাহাদের মনে ভরসা নাই...তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া শশ্রুষা করিয়া কেহ বাঁচাইতে পারে না । ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশজনে জোট বাধিলেই পারে ।'' কবিগুরু কৃষির সাথে সমবায়কে যুক্ত করে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ বাতলে দেন ।

আধুনিক কৃষি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত কবিগুরু তাঁর নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গবাদিপশু পালন শিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন । পরবতীত্বে আপন জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গপাধ্যায়কেও একই শিক্ষা লাভের জন্যে আমেরিকা পাঠান ।

পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা গ্রহণ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৮০ বিঘা জমির উপর কৃষি খামার গড়ে তোলেন ।কৃষি খামারের পাশাপাশি সেখানে একটি কৃষি গবেষনা কেন্দ্রও স্থাপন করেন ।তিনি কলিকাতার শ্রীনিকেতনে বনায়ন এবং আধুনিক আবাদের জন্যে বীজ ও ফলের চারা সরবরাহ করেন । ১৯৪০ সালের দিকে শ্রীনিকেতনের খামার গুলিতে অধিকাংশ জমি বর্গা প্রথায় চাষ করা হতো । প্রথমে দেশি গরু দিয়ে হাল চাষ করা হলেও পরবতীর্তে তিনি সিন্ধি ও মুলতানী গরু আমদানী করেন । তিনি কৃষি যান্ত্রিকী করণের জন্যে পতিসারে ৭টি বিদেশী কলের লাঙল কলিকাতা থেকে আনেন । তিনি পোল্ট্রি পালন সম্প্রসারনের জন্যে উন্নতজাতের মুরগীও আমদানী করেন ।

গ্রামীন অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণের শুভসূচনা কবি গুরুই করেছিলেন ।মহাজনের ফাঁদ থেকে গ্রামের সহজ সরল কৃষককে রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালে শিলাইদহে প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন । পরবর্তী কালে ১৯০৪ সালের দিকে তিনি সমবায় ব্যাংক ও ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতীয় কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্টা করেন । এর ফলে দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে যারা মহাজনী ঋণের ফাদেঁ আটকা পড়েছিলেন তারা যাতে মুক্তি পেতে পারেন তার জন্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ শুরু করেন । ১৯১৩ সালে নোবেল পদকের সাথে প্রাপ্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তার মুলধনে যোগ হওয়ায় কৃষি ব্যাংকের ঋণ দান ক্ষমতা বেড়ে যায় ।

কবি গুরু সমাজের শ্রেণী বিভেদ নির্বিচারে শিক্ষা, সংস্কৃতি , আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শহর থেকে পল্লীতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন , '' শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ ।পল্লী সমাজ সংবিধান নামে তিনি ১৫ দফা এক কর্মসূচীর কথা ঘোষনা করেন । যার ৮ ও ৯ নম্বর কর্মসূচী কৃষি আর কৃষকের উন্নতির কথা বর্ণিত ছিল । ৮ নম্বর কর্মসূচীর বিষয় ছিল –আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গোমহিষাদি পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান এবং কৃষি কার্যে উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা ।

কৃষি ক্ষেত্রে কবি গুরু তাঁর জীবদ্দশায় যে সৃজনশীল বহুমুখী চিন্তা চেতনা বাস্তবায়নের প্রয়াস ঘটিয়েছিলেন তাতে তিনি বাংলার মানুষের কাছে অন্যরকম আর এক রবীনদ্রনাথের স্বরুপ উন্মোচন করে গেছেন ।তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা আর লেখনিতে তিনি রুপক অর্থে কৃষিকে প্রাণবন্ত ভাবে ব্যবহার করেছেন । তাঁর সোনার তরী কাব্যে একজন সৎ মানুষের সারা জীবনের কর্মফল, মৃত্যুর পর অর্জিত পূণ্য সম্পদ পরজন্মে ব্যবহারকে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শ্রাবনের বিরামহীন বর্ষনের মধ্যে ফসল তোলার সাথে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন । তিনি লিখেছেন ...

গগণে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা
ভরানদী ক্ষুরধারা খর পরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ।

আবার তিনি লিখেছেন,

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকাজল করিছে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসি মাখা
গ্রাম খানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা ,
এপারেতে ছোট খেত আমি একেলা ।

জীবন সায়াহ্নে পূণ্যবান জন তাঁর আপন সৎ কর্মে সোনার তরী পূর্ণ করে এহধাম ত্যাগ করে পরপারে অন্তিম যাত্রা করেন ।পার্থিব প্রশান্তির মায়াজাল ছিন্ন করে বিদায়ক্ষণে সোনার তরী খানাতে আর ঠাঁই থাকে না এ নশ্বর দেহখানি বহিবার । তাই তো তিনি লিখে গেছেন,

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
তোমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।
শ্রাবণগগণ ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূণ্য নদীর কূলে রহিনূ পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ।।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অর্জিত সহস্র সোনার ফসলের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে কৃষি ভাবনার খোরাক আর কৃষি তথা কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রানান্ত প্রচেষ্টা ।তিনি আধুনিক কৃষি , সমবায় , ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংককিং ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম রুপকার তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ।

****

তথ্যসূত্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ও লেখক সমালোচক